WBMDFC

KNOWLEDGE SERIES IX

ওয়াজিদ আলি শাহ

মুখবন্ধ

সমাজ ইতিহাসের ধারায় দেখা গেছে কিছু কিছু মানুষ নিজের মেধা, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়-এর দ্বারা অনন্য হয়ে ওঠেন। সততা, মুক্ত চিন্তা ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা তাদের ব্যক্তিত্ব নিজ প্রজন্ম ও পরবর্তী প্রজন্মের কাছে প্রেরণাস্বরূপ।

'পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম' বিগত দিনের বাংলার কয়েকজন মনীষীর জীবন ও কর্মসাধনার বিবরণ একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্র ও পুস্তিকার (WBMDFC-Knowledge Series) মাধ্যমে বর্তমান প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার প্রয়াস করেছে। এদের কর্মসাধনা ও জীবনব্রত পাঠে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অবশ্যই অনুপ্রাণিত হবে বলে আমাদের ধারণা। এই মহৎপ্রাণ মানুষদের প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এই ক্ষুদ্র প্রয়াসের মাধ্যমে।

ড. পি. বি. সেলিম
চেয়ারম্যান
পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম

ভূমিকা

মানব সভ্যতার ইতিহাসে দেখা গেছে কিছু মানুষ নিজের মেধা, পরিশ্রম ও অধ্যবসায় এবং ত্যাগ দ্বারা হয়ে ওঠেন কালজয়ী। মুক্ত চিন্তা, ত্যাগ ও মানবজাতির সেবার মাধ্যমে তাদের কাজ চিন্তাভাবনা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে প্রেরণাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।

পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম এরূপ মনীষীগণের জীবন ও কর্মসাধনা এ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার প্রয়াস করেছে। WBMDFC- Knowledge Series বিভাগের প্রথম পর্যায়ে চারজন মনীষী হাজি মহম্মদ মহসিন, ডঃ হাসান সোহরাওয়ার্দী, তিতুমির ও ভগিনী নিবেদিতার কর্মসাধনা অতিসংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে।

WBMDFC- Knowledge Series-এর দ্বিতীয় পর্যায়ে আরো কতিপয় মনীষী যেমন বেগম রোকেয়া, বেনীমাধব বড়ুয়া, স্যার আজিজুল হক, শের-ই-বাংলা এ.কে. ফজলুল হক এবং লালন শাহ-এর কর্মসাধনা অতিসংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। আমরা আশা রাখি ওয়াজিদ আলি শাহ সম্পর্কে এই পুস্তিকাটি বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে উপকৃত হবে।

মৃগাঙ্ক বিশ্বাস, ডব্লিউ.বি.সি.এস (এক্সিকিউটিভ)
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম

ওয়াজিদ আলি শাহ

(১৮২২-১৮৮৭)

প্রকাশ কাল
মিলন উৎসব
জানুয়ারী, ২০২৪

পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংখ্যালঘু ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিষয়ক দপ্তরের অধীনস্থ একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা)

Printed at Saraswaty Press Limited

ওয়াজিদ আলি শাহ

(১৮২২-১৮৮৭)

১৮২২, ৩০ জুলাই, ওয়াজিদ আলি শাহ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আমজাদ আলি খান। আমজাদ আলি ছিলেন আওয়াধের রাজা। এই বংশের আদি পুরুষ এসেছিলেন পারস্য থেকে। ওয়াজিদ আলি শাহ-র সপ্তম উর্ধ্বতন পুরুষ নাসিরের দেশ ছিল খোরাসানের নিশাপুরে। নাসির ভাগ্যের খোঁজে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। নাসিরের পুত্র আমিন। ভাগ্যের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে একদিন দিল্লি পৌঁছলেন মুহাম্মদ আমিন। মুঘল সম্রাট ফারুখসিয়রের সেনাবাহিনীতে যোগ দিলেন। হলেন সুবেদার। সম্রাট ফারুখসিয়রের কাছ থেকে উপাধি পেলেন "হিফৎ- এ-হাজারি"। আর এক মুঘল সম্রাট মহম্মদ শাহ আমিনকে নতুন উপাধি দিলেন "সাদাত খান বাহাদুর"। তাঁকে আগ্রার শাসক করা হল। সাদাত খান বাহাদুর তার পর আওয়াধ রাজ্যের পাঁচ জেলা—খলিলাবাদ, ফৈজাবাদ, গোরখপুর, বহরাইচ আর লক্ষ্ণৌ শাসন করার ভার পেলেন। সাদাত খান (নবাব ১৭২২-৩৯)-এর ছিল একটিমাত্র কন্যা, পুত্র ছিল না। সেই কন্যার সঙ্গে বিবাহ হল তুর্কি মুহাম্মদ মকিম ওরফে সফদর জং-এর সাদাত খানের পর আওয়াধের শাসক বা নবাব হলেন সফদর জং (১৭৩৯-৫৪)। এর পর নবাব হন তাঁর পুত্র জালাল উদ্-দিন হায়দার শুজা-উদ্-দৌলা (নবাব ১৭৫৪-১৭৭৫), আসফ-উদ-দৌলাহ (শুজা-উদ্-দৌলার পুত্র, নবাব ১৭৭৫-১৭৯৭), ওয়াজির আলি (আসফ-উদ-দৌলার পালিত পুত্র, নবাব ১৭৯৭-১৭৯৮, সিংহাসনচ্যুত), দ্বিতীয় সাদাত আলি খান

(শুজা-উদ্-দৌলার পুত্র, নবাব ১৭৯৮-১৮১৪)। সাদাত আলির তিরোধানের পর তাঁর পুত্র গাজি-উদ-দিন হায়দার (রাজত্ব ১৮১৪-১৮২৭ নবাব-বাহাদুর হলেন। নামেই নবাব তিনি, সব সিদ্ধান্ত নেয় ব্রিটিশ কোম্পানি। এর মধ্যে হঠাৎ গাজি-উদ-দিনের পদোন্নতি হল, তিনি নবাব থেকে হয়ে গেলেন রাজা। নবাবের চেয়ে রাজা অনেক বড়। তাছাড়া নবাব তো দিল্লির বাদশার কাছে দায়বদ্ধ। এখন গাজি-উদ-দিন রাজা হওয়া মানে দিল্লির আনুগত্য স্বীকার করতে হবে না। ইংরেজদের সঙ্গে পিতার সব সন্ধি গাজি-উদ-দিন অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে লাগলেন, বাধ্য শাসকের মতো। তাঁর পরে আওয়াধের বাদশা হলেন নাসির-উদ-দিন হায়দার (গাজি উদ-দিন হায়দারের পুত্র, রাজত্ব ১৮২৭-১৮৩৭), মুহাম্মদ আলি শাহ (দ্বিতীয় সাদাত আলি খানের পুত্র, রাজত্ব ১৮৩৭-১৮৪২), আমজাদ আলি শাহ (মুহাম্মদ আলি শাহ-র পুত্র, রাজত্ব ১৮৪২-১৮৪৭), ওয়াজিদ আলি শাহ (আমজাদ আলি শাহ-র পুত্র, রাজত্ব ১৮৪৭-১৮৫৬)।

ওয়াজিদ আলির শৈশব খুব একটা সুখের কাটেনি, এ কথা তিনি আত্মজীবনীতে নিজেই জানিয়েছেন। ওয়াজিদ আলি তখন অষ্টম বর্ষে পা রেখেছেন। তাঁর মায়ের এক পরিচারিকা ছিল, যার নাম রহিমন। মধ্যবয়সী সেই পরিচারিকা বালক ওয়াজিদকে যৌন নির্যাতন করেন। রহিমনকে এর কিছু দিন পর কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়, সেখানে কাজ করতে এলেন আর এক পরিচারিকা, নাম আমিরন। আমিরনের বয়স ৩৫ থেকে ৪০ বছর। ওয়াজিদ আলির তখন ১০ বছর। আমিরনের রঙচঙে পোশাক দেখে ওয়াজিদ মুগ্ধ হলেন। তাঁর সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন ওয়াজিদ আলি। এর পর একের পর এক পরিচারিকা—বানু, হাজি খানা। মা মালিকা কিশবার ওয়াজিদ আলির বিবাহ দেওয়ার তোড়জোড় শুরু করলেন। পিতা আমজাদ আলি শাহ-র

বহু চেষ্টায় একটি মুঘল রাজকন্যা পাওয়া গেল। তাঁর নাম আজম বানু ওরফে মালিকা মুকাদ্দরা-ই-আজমা নবাব আলম আরা ওরফে বেগম পাদশাহ মহল সাহিবা। কিন্তু পাত্রী ওয়াজিদের থেকে পাঁচ বছরের বড়। সাধারণত এটা ঘটে না। ওয়াজিদের এই স্ত্রী খাস মহল নামে বেশি পরিচিত। ১৮৩৭, খাস মহলের সঙ্গে তাঁর নিকাহ হয়। এটি তাঁর প্রথম বিবাহ। ওই বছরে আওয়াধের রাজা নাসির-উদ-দিন হায়দারের মৃত্যু হয়, ওয়াজিদ আলির ঠাকুর্দা মুহাম্মদ আলি শাহ সিংহাসনে বসেন। ১৮৩৮ সালে খাস মহলের গর্ভে ওয়াজিদ আলির একটি পুত্র জন্মলাভ করে। তাঁর নাম শাহজাদা নশেরবান কদর, তিনি জন্মগতভাবে মূক ও বধির। ১৮৩৯ সালে দ্বিতীয় পুত্র শাহজাদা ফালাক কদর ওরফে মির্জা মুহাম্মদ জাভেদ আলি খানের জন্ম, মাতা খাস মহল। ১৮৪০ সালে জন্ম হয় শাহজাদা কাইবান কদর ওরফে মির্জা মুহাম্মদ হামিদ আলির, খাস মহলের গর্ভে। ১৮৪২ সালে ওয়াজিদ আলির ঠাকুর্দা রাজা মুহাম্মদ আলি শাহ প্রয়াত হন। পিতা আমজাদ আলি খান সিংহাসনে বসেন। ওয়াজিদ আলি, ওয়ালি আহদ অর্থাৎ যুবরাজ ঘোষিত হন।

ওদিকে লখনউ রাজসভার ব্রিটিশ রেসিডেন্ট জন শেক্সপিয়র ওয়ালি আহদ অর্থাৎ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী যুবরাজ ওয়াজিদ আলিকে একদম পছন্দ করেন না। ওয়াজিদের সঙ্গে কথা বলা তো দূর অস্ত, কয়েক বছর পর তিনি যুবরাজের বিরুদ্ধে গভর্নর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জকে অভিযোগ করে বসলেন। একটি রিসালাহ বা চিঠি পাঠানো হল বড় লাটকে। তাতে শেক্সপিয়র লিখলেনঃ

আওয়াধ রাজ্যের উত্তরাধিকারী ওয়াজিদ এক অবোধ বালক। সে ইতিমধ্যেই এক গাদা উপাধি নিয়ে ফেলেছে, যা তার পিতা বা পিতামহও নিতে সাহস করেননি। সেই সব উপাধি শুনতে ভাল

হলেও আসলে একেবারেই অর্থহীন কথা। এই সব আজেবাজে কাজ করে ওয়াজিদ আসলে তার ক্ষমতাহীনতাকেই জাহির করছে। সে নাকি আবুল মনসুর! বললে প্রত্যয় হবে না আপনার, এর মানে হল বিজয়ীর অনুসারী! সেখানেই থেমে থাকেনি অবধ রাজ্যের এই অবোধ বালক! সে পরের খেতাব নিয়েছে সাহিব-ই-আলম, যার অর্থ হল বিশ্বের প্রভু। লখনউ কোর্টের রেসিডেন্ট হয়ে এই সব আর আমি সহ্য করতে পারছি না। ওয়াজিদ আলি নিজেকে রাজা আমজাদ আলির পেশকার ঘোষণা করেছে। যাতে সে পিতার পর তাঁর ছায়া হয়ে রাজকার্য চালাতে পারে। গত তিন বছর ধরে সে যে শিক্ষানবিশি করেছে, তাতে রাজ্যের লাভ কী হল? ডেপুটি হয়ে সে কী কী কাজ করেছে, কোন বুদ্ধির ছাপ রেখেছে, তা আমি বুঝতে পারছি না।

এই রিসালাহ পড়ে গভর্নর জেনারেল রেগে কাঁই। ওয়াজিদ আলি রাজা হওয়ার আগেই ইংরেজরা বীভৎস ক্রুদ্ধ হয়ে পড়ল। কারণ তাদের টাকা কম পড়ছে। ওয়াজিদের বিলাসবহুল জীবনকে তারা ভাল চোখে দেখছে না। এ কথা জানিয়েও দেওয়া হল যুবরাজ এবং রাজাকে।

লখনউয়ের ব্রিটিশ রেসিডেন্ট জন শেক্সপিয়র গভর্নর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জকে আরও অভিযোগ করলেন, এই অবধ রাজ্যে সুখ নেই। রাজা আমজাদের রাজত্ব বিষাদে ভরা, দুঃখে দীর্ণ। যুবরাজ ছোটখাটো বিষয়ে খুব বেশি অনুরক্ত। এই ঘুড়ি ওড়াচ্ছে তো পরক্ষনেই পায়রা নিয়ে খেলচ্ছে। ওয়াজিদ আলি রাজা আমজাদ আলির উত্তরাধিকারী হিসাবে একেবারেই অযোগ্য। নিজেকে শোধরানোর কোনও চেষ্টা তার নেই। রাজার সহকারী বা পেশকার হিসাবে তার কোনও ভূমিকাই নেই। রাজকার্য বিষয়ে সে প্রায় কিছুই জানে না। অবধ রাজ্য তো শুধু লখনউ-র হজরতগঞ্জ,

আলমবাগ, কাইজারবাগ, আমিনাবাদ আর গোমতী নদীর তীর নয়, এই রাজ্যের বেশিটাই গ্রাম। আজ পর্যন্ত রাজার পেশকার ওয়াজিদ আলি একটা গ্রামেও যায়নি। প্রশাসন কী, তাও সে জানে না।

এদিকে ওয়াজিদ আলি শাহ নানা রকম সৃষ্টিশীল কাজে মেতে উঠলেন। ১৮৪৩ সালে লিখলেন বিখ্যাত নাটক রাধা কানহাইয়া কা কিসসা। ১৮৪৬ সালে তাঁর লেখা নাটক দরিয়া-ই-তা'আশশুখ মঞ্চস্থ হয়।

১৮৪৭ সালে পিতা আমজাদ আলির মৃত্যু হলে ওয়াজিদ আলি শাহ রাজা হলেন। আলি নকি খান হলেন তাঁর প্রধানমন্ত্রী। রাজার অভিষেকে লখনউ রাজসভার রেসিডেন্ট রিচমন্ডসহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন। রাজার অভিষেকের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উত্তরসূরী ঘোষণা করা হয়। রিচমন্ড ও আর একজন কোম্পানি কর্তা হেনরি ইলিয়ট রাজার সামনেই বসে ঠিক করলেন, রাজার হঠাৎ মৃত্যু হলে শাহজাদা ফালাক কদর সিংহাসনে বসবে। যেহেতু সে বালক, তাই তার অভিভাবক হবে রাজসভার ইংরেজ রেসিডেন্ট।

তার মধ্যেই নতুন রাজা ওয়াজিদ আলি নতুন রেসিডেন্ট রিচমণ্ডের তহবিলে সাত লাখ টাকা জমা করলেন এই শর্তে যে ওই টাকার পাঁচ শতাংশ সুদে ১৭০ জন শ্রমিকের নিয়মিত বেতন দেওয়া হবে, ঐ শ্রমিকরা আমজাদ আলির সমাধির কাজে ব্যাপৃত ছিল।

১৮৪৮ সালে তাঁর লেখা ইশকনামা প্রকাশিত হয়। এটি রাজা ওয়াজিদ আলি শাহ-রর আত্মজীবনী। এই বছরে নতুন গভর্নর জেনারেল হন লর্ড ডালহৌসি। অভিজ্ঞ উইলিয়ম স্লিম্যানকে লখনউ রাজসভায় রিচমণ্ডের জায়গায় পাঠালেন বড় লাট। স্লিম্যান অভিজ্ঞ মানুষ। নতুন রেসিডেন্ট খুব ভাল উর্দু ও ফারসি জানেন,

তাই রাজার সঙ্গে কথা বলতে তাঁর দোভাষী লাগে না। এ ছাড়া স্লিম্যান লেখালেখিও করতেন। যে ঠগিদের দমন করে তিনি খ্যাতি লাভ করেছিলেন, তাদের নিয়ে লিখেছেন আশ্চর্য সব কাহিনি।

স্লিম্যানের নিয়োগের পর লর্ড ডালহৌসি তাঁকে বললেন, পূর্বতন বড় লাট রাজাকে দু বছর সময় দিয়েছিলেন যাতে তিনি রাজ্যের হাল ফেরাতে পারেন। যদি রাজা সেই কাজে সফল না হন তাহলে ব্রিটিশ সরকার অবধ রাজ্যের শাসনভার নিজের হাতে তুলে নেবে।

ডালহৌসির মনোভাব বুঝতে পেরে তিনি বিলেতি কায়দায় অবধ রাজ্যের ভূমিসংস্কারে ব্রতী হলেন। প্রায় রাজ্য পরিক্রমায় বেরোতে লাগলেন স্লিম্যান, যেন তিনিই এই রাজ্যের রাজা। তখন অবধ রাজ্যের বারোটি জেলা—বাহারাইচ, দরিয়াবাদ, ফৈজাবাদ, গোন্ডা, হারদোই, লখনউ, মাহমুদি, প্রতাপগড়, রায়বেরিলি, সুলতানপুর, সীতাপুর ও উনাও।

কয়েক দিনের মধ্যে কোম্পানির এক উচ্চপদস্থ কর্তা হেনরি ইলিয়টকে স্লিম্যান লিখলেন, রাজা ওয়াজিদ একজন অযোগ্য শাসক এবং তিনি অত্যন্ত অসুস্থ।

১৮৫৩ সালে রাজার সৈন্যদলে সাময়িক বিদ্রোহ দেখা দেয়। তারা নাকি ঠিকঠাক বেতন পাচ্ছে না। অর্থমন্ত্রী বললেন, রাজকোষে অর্থের প্রাচুর্য না থাকলেও সৈন্যবাহিনীকে বেতন দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত টাকা আছে। রাজা বুঝতে পারলেন, এক গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। সে পর্বে সৈন্যদলে বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হল। রাজা পুনরায় কায়জারবাগে যোগী মেলা চালু করলেন।

১৮৫৪ সালে নতুন রেসিডেন্ট হয়ে এলেন জেমস আউট্রাম। আউট্রাম তাঁর আগমনের তিন মাস পর প্রতিবেদন প্রস্তুত করলেন। লিখলেন, আমি যা দেখছি তা হল অবধ রাজ্যের অবস্থা

বেশ শোচনীয়। ১৮৫৫ সালে কোর্ট অব ডিরেক্টরস ডালহৌসিকে অবধ রাজ্য সম্পূর্ণ অধিকার করার নির্দেশ দেয়। ১৮৫৬ সালে রাজাকে একটি সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করতে বলা হয়। সন্ধিপত্র রচিত হয়েছে এই ভাবে, অবধ রাজ্যের রাজস্ব, প্রশাসন, সেনাবাহিনীর সমস্ত দায়িত্ব রাজা চিরকালের জন্য তুলে দিচ্ছেন মহামান্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে। যদি রাজা এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর নাও করেন, আউট্রাম অন্য কোনও উপায়ে রাজ্য দখল করে নেবেন। আউট্রাম রাজাকে বললেন, এই সব কিছুর বিনিময়ে ওয়াজিদ আলি শাহ সারা জীবন ১২ লক্ষ টাকা বার্ষিক ভাতা পাবেন। যদি রাজা মনে করেন এই ভাতা যথেষ্ট নয়, তাহলে তা সর্বোচ্চ ১৮ লক্ষ টাকা করা যেতে পারে। কিন্তু রাজাকে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করতে হবে। ৪ ফেব্রুয়ারি রাজার সঙ্গে রেসিডেন্টের বৈঠক হল। বড় লাট ডালহৌসি আপনাকে তিন দিন সময় দিয়েছেন, তার মধ্যে আপনার অভিমত জানাতে হবে। আপনি এই চুক্তির শর্তাবলী ইচ্ছানুসারে মানতে পারেন বা নাও মানতে পারেন। সময়সীমা তিন দিন মাত্র। ৭ ফেব্রুয়ারি তিনি রেসিডেন্ট আউট্রামকে একটি চিঠি লিখলেন। পত্রে স্পষ্ট ভাষায় জানালেন, তিনি ওই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করবেন না। প্রয়োজনে কলকাতা যাবেন, আরও দরকার বুঝলে পাড়ি দেবেন বিলেত। ওয়াজিদ আলি শাহ-র রাজত্ব কেড়ে নেওয়া হল। ১৩ মার্চ, রাজা ও তাঁর সঙ্গীরা লখনউ থেকে কলকাতা যাত্রা করেন।

রাজা ওয়াজিদ আলি শাহ কলকাতায় চলে আসেন ওই বছরের মে মাসে। ১৫ জুন রাজমাতা, ভ্রাতা সিকান্দার হাসমত ও পুত্র হামিদ আলি বিলেত যাত্রা করেন, ১৫ অগস্ট তাঁরা সাদহাম্পটন পৌঁছন। ক্যানিং বলেন, রাজ্য ফেরানো অসম্ভব। ১৮৫৭ সালে বিলেতে রাজমাতা, সিকান্দার হাসমত ও হামিদ আলি কোর্ট অব

ডিরেক্টরসের সঙ্গে মিলিত হন, জানুয়ারি মাসে। কিন্তু ফল হয় না। ওই বছরের মে মাসে মিরাট ও দিল্লিতে বিদ্রোহ শুরু হয়। সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হলে ইংরেজরা ওয়াজিদ আলিকে গ্রেপ্তার করে ফোর্ট উইলিয়মে বন্দি করে রাখে। ১৬ জুন ওয়াজিদ আলি গ্রেপ্তার ও ফোর্ট উইলিয়মের কারাগারে বন্দি হন। ১ জুলাই, লখনউ অধিকার করে বিদ্রোহীরা। ওদিকে ৪ জুলাই, রাজমাতা, ভ্রাতা ও পুত্রের সঙ্গে রাণী ভিক্টোরিয়ার সাক্ষাৎ হয়। ৫ জুলাই, বিদ্রোহীরা লখনউর সিংহাসনে ওয়াজিদ আলি ও হজরত মহলের পুত্র বালক ব্রিজিস কদরকে বসান। বিলেত গিয়ে রাজমাতার কোনও ফল হয় না। তিনি হজে যাবেন বলে মনস্থ করেন। কিন্তু ১৮৫৮ সালের ২৪ জানুয়ারি রাজমাতা জনাব-এ-আলিয়া প্যারিতে প্রয়াত হন। ওই বছরের ২৫ ফেব্রুয়ারি ভ্রাতা সিকান্দার হাসমত লন্ডনে মারা যান। এদিকে মার্চ মাসে ইংরেজরা লখনউ পুনরায় অধিকার করে। ব্রিজিস কদরকে নিয়ে হজরত মহল কাঠমাণ্ডু পালিয়ে যান।

দীর্ঘ দিন কারাবাসের পর ১৮৫৯ সালের ৯ জুলাই রাজা মুক্তি পান। কারামুক্তির পরে শিল্প-অনুরাগী রাজা মনোনিবেশ করেন গান বাজনা ও অন্যান্য শিল্পচর্চায়। রাজাকে ফেরত দেওয়া হল রাজমুকুট। ওদিকে মেটিয়াবুরিজে ঘটে গেছে ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড। সেটা ১৮৬০ সাল। আগস্ট মাসে ইংরেজরা ওয়াজিদ আলির রাজমুকুট ফেরত দেয় বিলেতের রাণী ভিক্টোরিয়ার নির্দেশে কলকাতার বড় লাট তাঁর রাজমুকুট ফিরিয়ে দিলেন। এমনকি আজীবন তাঁকে 'রাজা' খেতাব ব্যবহারের অনুমতিও দেওয়া হল। রাজা উপাধি নয়, ওয়াজিদ আলির দরকার ছিল রাজমুকুটের।

বাদশা খেতাবের জন্য ওয়াজিদ আলি শাহ লালায়িত নন। তবে রাজমুকুটটি তাঁর বিশেষ প্রয়োজন ছিল। ওই মুকুটে আছে অজস্র মণিমুক্তো আর জহরত। তিনি সেই সব বিক্রি করতে চান।

অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছারখার হয়ে যাওয়া মেটিয়াবুরজকে সাজাতে গেলে দরকার টাকা। সেই অর্থ আসবে ওই মুকুটের মণি বিক্রি করে। রিসালদার দরওয়াজা থেকে চিনাপাড়া, কচ্চি সড়ক থেকে তিনওয়ালি মসজিদের দুই দিক, বাংলা বস্তি থেকে রহমানিয়া মসজিদ ও রামনগর পর্যন্ত পুনর্নির্মাণ করতে হবে। কলকাতায় আছে এক বিরাট বাজার। ওই বাজারে আসেন দেশের সব ধনী ব্যবসায়ীরা। সেই বৈঠকখানা বাজারে তিনি পাঠাবেন রাজমুকুটের হীরেজহরত। বণিকদের জহুরির চোখ, তাঁরা এই সব অমূল্য জিনিসের মর্ম বুঝবেন। ওয়াজিদ আলি শাহ তাঁর সাধের রাজমুকুট থেকে একে একে খুলে ফেললেন সব মাণিক, তার পর সেগুলি আবৃত করে পাঠালেন বিক্রি করতে। সেই রত্নসমূহে ওয়াজিদের, নাকি আখতারের অশ্রুও জমাট বেঁধে মুক্তো হয়ে বিক্রি হয়ে গেল।

শুরু হল পুনর্নির্মাণ। বন কেটে পরিষ্কার করা হল। দাবানলে পুড়ে যাওয়া বৃক্ষ উপড়ে ফেলে রোপণ করা হল নতুন সব গাছ। সবুজে ভরে উঠল মেটিয়াবুরজ। গঙ্গার ওপারে কিড সাহেবের বাগান থেকে আনা হল চারাগাছ। তৈরি হল নতুন বাসগৃহ। মানুষ এল। পাখিরাও এল। ওয়াজিদ আলি কিছু পশুও আনলেন। তাঁর সেই লখনউর চিড়িয়াখানার কথা মনে পড়লো, তিনি মেটিয়াবুরজে চিড়িয়াখানা গড়ে তুলতে উদ্যোগী হলেন।

ধার দেনা করতে করতে অর্থকষ্টের চরম সীমায় পৌঁছে গেলেন রাজা। ও দিকে তাঁর স্বাস্থ্যও ভাল নয়। মেটিয়াবুরজকে লখনউর মতো করে সাজানো তো দূর অস্ত, এত মানুষজনের খাওয়াপরার ভাবনা তাঁর জীবনের ধ্যানজ্ঞান হয়ে উঠল। নিদ্রাহীন স্নায়ুরোগী রাজা শুধু খোদাকে ডাকেন আর জায়নামাজের পাটিতে বসে মোনাজাত করেন।

কেল্লার কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর বড় লাট রাজাকে যে বাড়িটি উপহার দিয়েছিলেন, সেটি আদতে ছিল তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি লরেন্স পিল সাহেবের বাসস্থান। অপূর্ব এই সৌধটিকে রাজা কোম্পানির কাছে বন্ধক রেখে টাকা ধার করলেন। এর মধ্যে মনোহর দাস নামের এক মহাজন কলকাতার উচ্চ আদালতে রাজা ওয়াজিদ আলির বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করলেন এই মর্মে যে রাজা তাঁর কাছ থেকে প্রচুর টাকা কর্জ করে এখন ফেরত দিচ্ছেন না।

রাজা ওয়াজিদ আলি যখন গার্ডেন রিচ হাউস বন্ধক দিয়ে কোম্পানির কাছ থেকে টাকা নিয়েছিলেন তখন তৈরি হয় একটি বন্ধকনামা। যে তিন রাজপ্রতিনিধি বন্ধকনামা তৈরি করেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রথম জন ছিলেন রাজার হিসাব-রক্ষক সফদর আলি। দ্বিতীয় ব্যাক্তি রাজার শ্যালক, জুলফিকর-উদ-দৌলা। তিনি অতি বিশ্বস্ত মানুষ এবং রাজার সঙ্গে কারাবাস করেছেন। মনোহর দাসের মামলায় আদালত প্রশ্ন করল, গার্ডেন রিচ হাউস কি আদৌ ওয়াজিদ আলি শাহ বন্ধক দিতে পারেন? কারণ তা রাজাকে কোম্পানি থাকার জন্য উপহার দিয়েছিল। এই প্রশ্ন আগেও উঠেছিল। তবে সে সময় বড় লাট এলগিন বলেছিলেন যে রাজাকে আদালতের শমন পাঠানো যাবে না। ফৌজদারি বা দেওয়ানি সে যে মামলাই হোক না কেন! আর ওয়াজিদ আলি শাহকে গ্রেপ্তারও করা যাবে না। এতে করে মহাজনরা যারপরনাই ক্ষুব্ধ হলেন। ইংরেজ কর্তারা বললেন, যে সব মহাজন রাজাকে টাকা ধার দেবেন, তা নিজের দায়িত্বেই তাঁরা দেবেন। সরকার কোনও ভাবেই এর দায়ভার নেবে না। এই সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন হেনরি মেইন। তিনি একজন নামজাদা ইতিহাসবিদ ও আইনজ্ঞ। ইংরেজ সরকারের হয়ে তিনি কলকাতার মহাজনদের সতর্ক করলেন।

মেটিয়াবুরজের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পর ১৮৬৪ সালে সাইক্লোন এল। এত ভয়ঙ্কর সেই ঝঞ্ঝা যে হাওয়া মাপার যন্ত্রও গেল উড়ে। ভেঙে গেল শতাধিক ইটের তৈরি পাকা বাড়ি আর দশ হাজার কাঁচা বাড়ি। ঝুপড়ি যে কত সুতো কাটা ঘুড়ির মতো উড়ে গেল সেই খবর কেউ জানে না। লক্ষাধিক মানুষ হয়ে পড়লেন নিরাশ্রয়। ষাট হাজারের বেশি লোক মারা গেলেন এই ঘূর্ণিঝড়ে। কলকাতার উপকূলে ছিল শ দুয়েক জাহাজ। তাদের মধ্যে ধ্বংস হয়ে গেল প্রায় সব কটি। খেজুরি আর হিজলি নামে বঙ্গদেশের যে দুটি সুন্দর বন্দর ছিল তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল এই ঝড়ে। কলকাতায় এই সাইক্লোনে মারা গেলেন ষাট হাজার মানুষ। শুধু বাসগৃহ নয়, ধ্বংস হয়ে গিয়েছে তিনটি গির্জার চূড়া। ফিরিঙ্গিদের ৯২টি আর দেশীয়দের ৯০ হাজার বাড়ি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। খিদিরপুর বন্দর থেকে নোঙর ছিঁড়ে বহু জাহাজ বঙ্গোপসাগরের উলটো দিকে চলতে শুরু করে। কুড়িটি জাহাজের সলিল সমাধি ঘটে, ১৪৫টি জাহাজ নষ্ট হয়ে যায়। কলকাতার বরাহনগর অঞ্চলে লোচন ঘোষের ঘাটের উপরে একটি জাহাজ উঠে পড়ে। আর একটি জাহাজ বরাহনগর পাট কলের তীরে এবং তৃতীয় একটি বাষ্পীয় জাহাজ কুটিঘাটের জয় মিত্র কালিবাড়ির নহবতকে চূর্ণ করে নিজেও বিচূর্ণ হয়। আর একটি জাহাজ ডুবে গিয়েছে সালকিয়ার কাছে

বিড়ম্বনা রাজার নিত্য সঙ্গী। এরই মধ্যে রাজা ঠিক করলেন লখনউর ইমামবাড়ার আদলে মেটিয়াবুরজে গড়ে তুলবেন ইমামবাড়া। ইমামবাড়া হল হাসান ও হোসেনের স্মরণে নির্মিত ইমারত। বিচালিঘাটের কাছেই নির্মিত হল সেই সৌধ। এই ইমামবাড়ার নাম সিবতায়নাবাদ। সিবতায়ন হল দ্বিতীয় ইমাম হাসান ও তৃতীয় ইমাম হোসেন। মেটিয়াবুরজের সিবতায়নাবাদ

ইমামবাড়া দ্বিতীয় ইমাম হাসান এবং তৃতীয় ইমাম হোসেনের স্মরণে নির্মিত ইমারত। হাসান-হোসেন দু জনেই ছিলেন হজরত মহম্মদের দৌহিত্র। ইমাম হাসানকে বিষপ্রয়োগ করে হত্যা করা হয় এবং ইমাম হোসেনকে হত্যা করা হয় কারবালার যুদ্ধে। সেই স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য বিশ্বের নানা দেশে তৈরি হয়েছে ইমামবাড়া। তেমনই এক ইমামবাড়া হল সিবতায়নাবাদ। রাজার বানানো সেই সিবতায়নাবাদ বা শাহি ইমামবাড়ার বাইরের দেওয়ালে রাখা হল মাছের তসবির। আর প্রবেশ পথে বানানো হল জোড়া মৎস্যকন্যা।

পরিখানা ও সুলতান মহল ছাড়া আরও দুটি প্রাসাদ বানাতে উদ্যোগী হলেন রাজা ওয়াজিদ আলি শাহ্। তাদের নাম আসাদ মঞ্জিল ও মুরাসসা মঞ্জিল। রাজা নিজে একজন দক্ষ স্থপতি। এত সব সৌধ শুধু নিজের চারপাশে ঘোরা অনুচরদের জন্যই করেননি। বিশাল প্রমীলাবাহিনীর জন্য অনেক ইমারত বানাতে হয়েছিল তাঁকে। প্রত্যেকটি সৌধের চারপাশে ছিল সুন্দর বাগান ও মনোহর ফাঁকা জায়গা। কাসর-উল-বাইজা, গোশা-এ-সুলতানি, শাহিনশা মঞ্জিল, শাহ মঞ্জিল, নুর মঞ্জিল, তাফরিহ বখশ, বাদামি, আসমানি, তহনিয়ৎ মঞ্জিল, হাদ-এ-সুলতানি, সাদ-এ-সুলতানি এবং আদালত মঞ্জিল ছিল সুরম্য বাসভূমি। সুলতানখানাকে ঘিরে ছিল বেগম ও বিবিদের আবাসগৃহ। গঙ্গার তীরে বহু এক কামরার বসার ঘর আর শোওয়ার ঘর, যাতে ক্লান্ত মানুষ নদীর ধারে বসে বা শুয়ে একটু শান্তি পায়। সেই সব ঘরের আসবাবপত্র ছিল দেখার মতো। রুপোর খাট আর মেঝেতে পাতা পারস্যের গালিচা। ঝাড়ুদাররা সব সময় ঝকঝকে তকতকে রাখে ঘরদোর এবং আসবাবপত্র। মালিদের পরিচর্যায় বাগান আর ফাঁকা ঘাসজমি সুন্দর ভাবে সাজানো গোছানো। ফাঁকা জমিতে ঘাস এবং অন্যান্য

লতা জাতীয় গুল্ম দিয়ে নানা নকশা করা। রাস্তার দু পাশে সারি সারি দোকান, সেখানে মনোহারী দ্রব্য থেকে শুরু করে পাওয়া যায় নিত্য প্রয়োজনের জিনিস। সুলতানখানার প্রবেশদ্বারে আছে একটি রক্ষীগৃহ। সেখানে তিন ঘন্টা অন্তর ঢাক বেজে ওঠে যাতে সময় সম্পর্কে মানুষ সতর্ক হয়। অবধের রাজাদের ছিল নানা রকমের ঘড়ির শখ। ওয়াজিদ আলি শাহও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। তাঁর সংগ্রহে ছিল অনেক রকমের ঘড়ি। হাতঘড়ি, পকেটঘড়ি ও দেওয়ালঘড়ি আসত সুইজারল্যান্ড থেকে। সিবতায়নাবাদ ইমামবাড়ায় রাখা হয়েছিল এক বিশেষ দেওয়ালঘড়ি, তার নাম বেভার্লি ক্লক।

ওয়াজিদ আলি শাহ মেটিয়াবুরজে ছোটা ইমামবাড়াও বানালেন, যার নাম দেওয়া হল বাইতুল নাজত। এ ছাড়া আগেই বানিয়েছেন মহিলাদের ইমামবাড়া কাসরুল বুকা বা শোকাবাস। সুলতানখানার অন্দরে রাজা নিজের জন্য বানিয়েছেন একটি মসজিদ, যাকে মেটিয়াবুরজের মানুষ ডাকেন শাহি মসজিদ নামে। দিনে দিনে মেটিয়াবুরজের চেহারা গেল বদলে। বাইরের মানুষজন এই এলাকাকে ইহলোকের স্বর্গোদ্যান বলে ডাকতে লাগল। ক্রমে রাজার মন থেকে রাজ্য হারানোর দুঃখ ফিকে হতে লাগল। মেটিয়াবুরজের নাম হল ছোটা লখনউ। এই ছোটা লখনউ যেন রাজার চোখের মণি, তাঁর গর্ব ও অহঙ্কার। রাজা এই ছোটা লখনউকে প্রাণাধিক ভালোবাসেন। তাঁর এই ছোট্ট রাজত্ব শুধু বাঙালি ভদ্রলোকদের উন্নাসিকতার জবাব নয়, একই সঙ্গে ইংরেজদের অপরিমেয় লালসার বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ। যখন কলকাতা শহরে ইংরেজিয়ানা নানা ভাবে বিভিন্ন স্তরে নিজেদের দীর্ঘ ছায়া ফেলতে শুরু করেছে তখন ওয়াজিদ আলি শাহ-র মেটিয়াবুরজ যেন সে সবের বিরুদ্ধে সাবেকিয়ানাকে স্থিত প্রজ্ঞার মতো তুলে ধরল।

রাজা জানেন, লখনউর জাঁকজমক আর ঐশ্বর্য কেড়ে নিয়ে খোদা তাঁকে দরিদ্র করেছেন বটে, কিন্তু মেহেরবান খোদা দয়ায় রাজার কাছে এই দারিদ্রের আবির্ভাব আসলে ঐশ্বর্য।

লখনউর সেই ভাষা, এক ঘুড়ি, সেই কবিতা, রসবোধ, মুরগি লড়াই, এক অহফেন সেবন মেটিয়াবুরজেও চালু হয়ে গেল। অভিন্ন কায়দায় সমান জৌলুসে বেরোতে থাকল তাজিয়া। বাজতে লাগল নহবত। মানুষের কথার মধ্যে ঠিকরে বেরোতে লাগল রসিকতা। রাজার তা ভারি পছন্দের। তিনি একদিন দরবারে বসে বললেন, একটি আরবি প্রবাদ আছে, নুন ছাড়া যেমন তরকারি হয় না তেমনই রসিকতা ছাড়া কথা বড় বিস্বাদ। কিন্তু সেই রসিকতায় যদি বুদ্ধি কিংবা চিন্তার ছাপ না থাকে তা হয়ে পড়ে বড়ই কষ্ট ও দুঃখের। রাজা নিজেও উর্দু ভাষায় ছলের ব্যবহার করতে খুব ভালবাসতেন। কলকাতার উপকণ্ঠে নির্বাসিত রাজা ওয়াজিদ আলি শাহ ছোট্ট একটি রাজত্ব গড়ে তুললেন যেখানে গানবাজনা, নৃত্য, থিয়েটার, চিত্রকলা ও কবিতার জমজমাট মুশায়েরা হতে লাগল প্রতিদিন। ওদিকে রাজা প্রতিদিন বসে তদারকি করছেন তাঁর সাধের পশুশালার। রাজার মেটিয়াবুরজ দরবারে রয়েছেন ছ হাজার কর্মচারী। তাঁদের মধ্যে শিয়া মুসলমান যেমন আছেন তেমনই আছেন সুন্নি। নিজে শিয়া বিশ্বাসে অটল থেকেও রাজা কখনও সুন্নিদের অবজ্ঞা করেননি। রাজার কর্মচারীদের মধ্যে সিংহভাগ হল সুন্নি মুসলমান। তিনি বলতেন, আমার দুটি নয়ন হল শিয়া আর সুন্নি। তাই সাধের পশুশালায় দারোগা হিসাবে নিযুক্ত করেন একজন সুন্নিকে। ওয়াজির মুনশি-উল-সুলতান থেকে বখশি মুনসারিম-উদ-দৌলাহ পর্যন্ত সকলেই সুন্নি। এমনকি তাঁর দুই ইমামবাড়া–সিবতায়নাবাদ ও বাইতুল নাজাতের দেখভালও শিয়ারা করতেন না। হিন্দুদেরও তিনি খুব ভালবাসতেন। লখনউয়ে তাঁর

হিন্দুপ্রীতি দেখে মৌলবি-মৌলানারাও ক্ষুব্ধ হতেন। মেটিয়াবুরজে এসে রাজা সেই দোল, যোগিয়ামেলার সংস্কৃতি বজায় রাখলেন।

একবার দোলের দিন রাজা ঠিক করলেন, রঙ খেলার আগে তিনি নাচবেন। কত্থক নৃত্যে অসামান্য দক্ষতা তাঁর। পরে নিলেন ঘাগরা। তার পর শুরু হল নৃত্য। ওয়াজিদ আলি নারীর পোশাক পরেছেন কেবলমাত্র নৃত্যের প্রয়োজনে। যখন তিনি পালায় কৃষ্ণের বেশে নাচতেন তখন তাঁর শরীরে অন্য পোশাক। কিন্তু কত্থক নাচতে হলে তিনি নর্তকীর সাজ ভালবাসতেন। সেই নাচের আসরে আসতেন যদু ভট্ট, অঘোরনাথ চক্রবর্তী, ধীরেন্দ্রনাথ বসু, শ্যামলাল চক্রবর্তী আর সাজ্জাদ মহম্মদ। ওদিকে পাথুরেঘাটার ঠাকুরবাড়ি থেকে বহু গায়ক মেটিয়াবুরজ আসতে শুরু করেছেন। দর্পনারায়ণ ঠাকুরের পুত্র গোপীমোহন সঙ্গীতের অত্যন্ত ভক্ত মানুষ ছিলেন। তাঁর সভায় ছিলেন সব দিকপাল গুণী মানুষ। মৃদাঙ্গাচার্য লালা কেবল কিষণ, গায়ক সঞ্জু খাঁ, সংগীতাচার্য কালী মির্জা, অন্ধগায়ক লক্ষীকান্ত বিশ্বাস। ওই বাড়ির প্রখ্যাত গায়ক হলেন শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। তাঁর গুরুরা ছিলেন ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, লক্ষ্মীপ্রসাদ মিশ্র এবং সাজ্জাদ মহম্মদ, জোয়ালা প্রসাদ, কামতাপ্রাসাদ, মুরাদ আলি, শিবনারায়ণ মিশ্র, গুরুপ্রসাদ মিশ্র, আলি বখশ, বাসিত খান, আহম্মদ খান, আসাদুল্লা খান, কৌকভ খান। বাঙালি ওস্তাদরা হলেন গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, যদু ভট্ট, কেশবচন্দ্র মিত্র আর কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরা সুযোগ পেলেই ওয়াজিদ আলি শাহ-র মেটিয়াবুরজের দরবারে চলে আসতেন। বিষ্ণুপর ঘরানার যদু ভট্টকে দেখে রাজা খুব আনন্দিত হতেন। এই ঘরানার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তানসেনের বংশধর ওস্তাদ বাহাদুর খান। একটা সময়ে বিষ্ণুপুর ছিল বাংলার সঙ্গীতচর্চার একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু। এই ঘরানার প্রধান শিল্পী যদু ভট্ট।

নিয়ামতউল্লাহ খানের সরোদ ঘরানা বহন করেছেন তাঁর দুই পুত্র কেরামতউল্লাহ ও আসাদউল্লাহ। তাঁদের ইন্তেকালের পর কৌকভ খান এই ঘরানার বাহক হন। কৌকভ খান কলকাতায় বাস করতে থাকেন এবং অন্য রকম সরোদ ঘরানার চর্চা করেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন ধীরেন্দ্রনাথ বসু।

বাদশা ওয়াজিদ আলি শাহ গানবাজনা, নাচ, নাটক ইত্যাদিতে মশগুল হওয়া সত্ত্বেও ধর্মচর্চা থেকে কোনও দিন সরে আসেননি। যখন শাহি মসজিদ বানানোর পাকা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, তখন রাজা ঘোষণা করেছিলেন, যে ব্যক্তি সাবালক হওয়ার পর কোনও দিন নমাজ কামাই করেননি তিনিই এই মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। এই কাজ অতি সম্মানের। কিন্তু কোনও মানুষ এগিয়ে এলেন না। এক মাস কেটে যাওয়ার পর রাজা নিজেই সেই কাজ করলেন।

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে রাজা ওজু সেরে ফজরের নমাজে বসতেন। তারপর চলত কোরান পাঠ। আটটা-নটা অব্দি সেই চর্চার পর রাজা সামান্য জলযোগ করতেন। বিভিন্ন দিন বিভিন্ন রকমের নাশতা। মুজফফর, সাফাইদা, শির মাল, পাপড়ি হালবা, বালু শাহি, জালাবিয়া, বালাই, আব-এ-হায়াত মালাই ছিল তাঁর নাশতার প্রিয় কয়েকটি পদ। দুপুরে রাজা বসতেন জোহরের নমাজে। প্রার্থনা শেষে লাঞ্চ বা দুপুরের খানা।

দুপুরের খাবারের শুরুতে রাজা ওয়াজিদ আলি খেতে ভালবাসতেন মুরগির গোস্তের চপ, ভেড়ার গোস্তের টিকিয়া, মুর্গ রেশমি কাবাব। মুরগি-চপ বানানো হত পোস্ত আর দই দিয়ে। গোশত টিকিয়া ভেড়া বা ছাগলের মাংসের। মুর্গ রেশমি কাবাব সবুজ এলাচ আর আদা দিয়ে বানাতে বলতেন তিনি। দুপুরের মূল খাবার হিসাবে

থাকত দম পুখত বিরিয়ানি কিংবা গোশত-এ-মেটিয়াবুরজ-বিরিয়ানি। শেষেরটি রাজার নিজের আবিষ্কার। আলু, ডিম আর মাংস দিয়ে অপূর্ব স্বাদের সেই বিরিয়ানি। মেটিয়াবুরজে প্রথম বিরিয়ানির মধ্যে আলু দেওয়ার প্রচলন শুরু হয়। মানুষ এত গরীব ছিলেন যে পর্যাপ্ত মাংস কিনতে পারতেন না। রাজার ক্ষেত্রে অবশ্য সেই যুক্তি খাটে না। তিনি রান্নায় নানা রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা ভালবাসতেন। বাবুর্চিরা কিছুতেই সেই রন্ধনপ্রণালীর রহস্য ফাঁস করতেন না। স্থানীয় মানুষরা রাজার কাছে দরবার করলে ওয়াজিদ আলি শাহ নিজেই সেই প্রণালী বলে দিতেন। কখনও সখনও মাছের বিরিয়ানিও রাজার দুপুরের খাবারে থাকত। আওয়াধের চতুর্থ নবাব আসফ-উদ-দৌলা তাঁর রাজধানী ফৈজাবাদ থেকে লখনউতে নিয়ে আসেন। একবার তিনি গোমতীতে নৌকো করে আসছেন এমন সময় একটি মাছ নদী থেকে লাফিয়ে নবাবের কোলে এসে পড়ে। তিনি এটিকে শুভ লক্ষণ বলে ধরে নেন। সেই থেকে অবধে মাছের ছবি সর্বত্র দেখা যায়। তিনিই মাছের বিরিয়ানির চল করেছিলেন।

রাজার এক বেগম শাহি টুকরা নামের এক রুটি বানান। তাতে থাকত চিনি, নানা রকমের বাদাম, মালাই, জাফরান ও গোলাপ পানি। বাদশা খুব ভালবাসতেন এই রুটি। পছন্দ করতেন নরম কাকোরি কাবাব। মাংসের চর্বি বাদ দিয়ে সেখানে দেওয়া হত খোয়া। ফলে কাবাব হত তুলতুলে নরম। রাজা দুপুরের খাবার শেষ করতেন ফিরনি, জর্দা পোলাও কিংবা লাচ্ছা সিমুই দিয়ে। তার পর একটু বিশ্রাম। বিকেলে আসরের নমাজ পড়ে চলে যেতেন পশুশালায়। কলকাতায় এমন বড় ও বিচিত্র পশুশালা আর দ্বিতীয়টি নেই। লখনউ থেকে আসার সময় অনেক পশু ও পাখি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন বাদশা। আবার কলকাতায়ও

বহু পাখি-পশু কিনেছেন তিনি। রাজার পোষা বাঘ-সিংহরা তাঁর অনুগত ছিল। শোনা যায়, মেটিয়াবুরজের পাশে বহমান গঙ্গার নীচ দিয়ে একটি সুড়ঙ্গ পথ আছে, সেটি সোজা গিয়ে উঠেছে কিড সাহেবের বাগান শিবপুরে। এই অঞ্চলের লোকজন বলে, রাজা কখনও সখনও সেখানে প্রাতর্ভ্রমণে যেতেন, আর তাঁর সঙ্গে থাকতো পোষা সিংহ কিংবা বাঘ। গঙ্গার নীচে ওই সুড়ঙ্গ নাকি রাজার নির্দেশ মতো খনন করা হয়েছিল। আসরের নমাজ শেষে প্রায় প্রতিদিন ওয়াজিদ আলি বসতেন আজাদ মঞ্জিলে, তাঁর প্রিয় চিড়িয়াখানায়। সুলতানখানা থেকে পশুশালা প্রায় আধ মাইল পথ। রাজা ওই রাস্তাটুকু যেতেন বোচায় চড়ে।

বোচা হল এক রকমের পালকি চেয়ার। তার চার দিক ধরে আট জন বেহারা রাজাকে বহন করত। রাজার প্রিয় বোচার নাম গঙ্গা-যমুনা। যখন তিনি বোচায় চেপে গঙ্গার ধার দিয়ে যেতেন তাঁর পরনে থাকত আংরাখা আর লখনউর কুচনো পাজামা। সূক্ষ্ম শরবতি মখমলি কাপড়ের বানানো সেই আংরাখার বুকের বাম দিকটা ছিল অদ্ভূতভাবে কাটা যাতে রাজার একটি অংশ সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। রাজা বলতেন, আমার হৃদয় সর্বদা খোলা, তাই পোশাকেও সেই চিহ্ন রেখেছি। শীতে একটা হালকা শাল গায়ে জড়াতেন। সন্ধ্যা অব্দি চিড়িয়াখানায় থাকতেন তিনি। মগরিবের নমাজ পড়তেন সেখানেই। তার পর সুলতানখানায় ফিরতেন। এশার নমাজ সেরে দরবার চালু করতেন। নানা ধরনের লোক বিভিন্ন কাজ নিয়ে দরবারে আসত। আসতেন কর্মচারীরা।

মেটিয়াবুরজ সব সময় অবর্ণনীয় আনন্দে ভেসে থাকত। নাচ আর গান চলত রাতের খাওয়াদাওয়ার আগে পর্যন্ত। রাতে খুব হালকা খাওয়াদাওয়া করতেন মেটিয়াবুরজের বাদশা। তবে নাচগানের আসর কখনও মধ্যরাত অব্দি গড়াত। কিন্তু রাজা ভোরবেলায়

উঠে পড়তেন কারণ তাঁকে ফজরের নমাজ আদায় করতে হবে। ধার্মিক রাজা ওয়াজিদ আলি কোনও দিন মদ্যপান করেননি। নেশা বলতে ছিল মাঝেমধ্যে হুঁকো খাওয়া।

মেটিয়াবুরজে নানা রকমের লোক। ভাল এবং মন্দ, কেউ কেউ মিশ্র। জুয়া, মদ্যপান, চুরি যে এই অঞ্চলে ছিল না, এ কথা বলা যাবে না। মেটিয়াবুরজ তল্লাটে কোম্পানির পুলিশ ঢুকতে পারত না। গার্ডেন রিচের নীচের অংশ অর্থাৎ দক্ষিণ দিক ছিল অপরাধীদের মুক্তাঞ্চল। মেজর হার্বার্টকে এই এলাকার আইন রক্ষার ভার দেওয়া হয়েছিল। তিনি অবশ্য সুলতানখানা, আসাদ মঞ্জিল আর মুরাসসা মঞ্জিলের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। রাজা ওয়াজিদ নিজের টাকায় যে সব বাড়ি কিনেছিলেন সে সবের দেখভালের দায়িত্ব হার্বার্ট নেননি। হার্বার্ট রাজাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, ইচ্ছে করলে ওয়াজিদ আলি নিজেই পুলিশ নিয়োগ করতে পারেন। ওই পুলিশ রাজার আত্মীয়স্বজন ও অনুগত সঙ্গী আর ভৃত্যদের সুমারি করে তাদেরই শুধু এলাকায় প্রবেশ করতে দেবে। রাজা সেই প্রস্তাবে সাড়া দেননি। তিনি নিজের রক্ষীদের নিয়ে যথেষ্ট সন্তুষ্ট ছিলেন।

এছাড়া এলাকায় আরেকটি সমস্যা প্রকট হয়ে উঠল। অপরিচ্ছন্নতা আর স্বাস্থ্যব্যবস্থার অভাব। সরকারের তরফে ডাক্তার পাঠানোর কথা উঠলে রাজা তাদের জানান যে তাঁরা হেকিমের চিকিৎসাব্যবস্থায় সন্তুষ্ট। রাজার চিকিৎসক ছিলেন হেকিম তা'ইব-উদ-দৌলাহ যিনি সর্ব রোগের দাওয়াই জানতেন বলে রাজার বিশ্বাস ছিল। তবে রাজার এক কর্মচারী আমির আলির উদ্যোগে রাজার কয়েক জন সন্তান গুটি বসন্তের টীকা নিয়েছিল। সার্জেন কালিদাস বসু তাঁদের লিকাহ বা ভ্যাকসিন দেন। রাজা যখন দেখলেন টীকা নেওয়ার পরেও তাঁর সন্তানরা বেঁচে আছেন তখন ওয়াজিদ আলির বিলেতি

চিকিৎসার উপর একটু আস্থা তৈরি হল। ওদিকে মেটিয়াবুরজে চোর ডাকাতের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে লাগল। নেশাভাঙ করে লোকে রাস্তায় পড়ে থাকে। দিনেদুপুরেও ছিনতাই জালিয়াতি চলতে থাকল। আইন ব্যবস্থা ছিল বেশ ঢিলেঢালা। রাজা ব্যস্ত ছিলেন শিল্প চর্চায়।

সৌধ বানানোর মতো রাজার আর এক শখ পশুপালন। এই শখ ছিল তাঁর রক্তে রাজা তা পেয়েছেন পূর্বসূরী নবাব শুজা-উদ-দৌলা ও আসফ-উদ-দৌলার কাছ থেকে। কলকাতায় দু-তিনটে চিড়িয়াখানা আছে বটে, তবে তাদের অবস্থা তেমন ভাল নয়। ব্যারাকপুর বা খিদিরপুরের চিড়িয়াখানা ওয়াজিদ আলির পশুশালার কাছে অতি তুচ্ছ। তাঁর বিশাল চিড়িয়াখানার পাশে মুরাসা মঞ্জিলের মাঝখানে ছিল শ্বেত পাথরে বাঁধানো একটি জলাশয়। সেখানে রয়েছে অনেক পাখি আর মাছ। পরিযায়ী পাখিরাও শীতকালে আসে। এই চিড়িয়াখানার আগে অবশ্য কলকাতায় রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর চোরাবাগানের মার্বেল প্রাসাদের অন্দরে একটি পশুশালা বানিয়েছিলেন। সে অনেক দিন আগে। সিপাহী বিদ্রোহের তিন বছর আগে। রাজেন্দ্র মল্লিক বিদেশ থেকে পশু আনতেন। মল্লিক বাহাদুরকে অনুসরণ করে ওয়াজিদ আলিও এডয়ার্ড ব্লিথ নামের এক প্রাণীতত্ত্ববিদ এবং আন্তর্জাতিক পশু বিক্রেতার কাছে জন্তু ক্রয় করতে থাকেন। ব্লিথ এশিয়া থেকে বহু পশু ইউরোপের চিড়িয়াখানায় সরবরাহ করতেন, তেমনি সে দেশগুলোর জন্তু এনে বেচতেন হিন্দুস্থানে।

এডয়ার্ড ব্লিথ ছিলেন এশিয়াটিক সোসাইটির তত্ত্বাবধায়ক। একটা সময় অবশ্য তাঁর পশুব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়। তাঁর বিলেতের দালালরা তাঁকে পথে বসিয়ে ছাড়ে। ব্লিথ সাহেব এই ব্যবসায় চার্লস

ডারউইন ও বিশিষ্ট পক্ষীবিজ্ঞানী জন গোল্ডকে নামানোর চেষ্টা করেছিলেন। পশুব্যবসা আন্তর্জাতিক বাজারে ভীষণ লাভজনক ছিল। ওয়াজিদ আলি যখন রাজ্য হারিয়ে কলকাতা চলে আসেন তখন তাঁর লখনউ চিড়িয়াখানার কিছু পশু খুব কম দামে কিনে নিয়েছিলেন ব্লিথ। তখন ওই সাহেব যে সব পশু কিনেছিলেন তার মধ্যে ছিল ১৮টি বাঘও। খরিদ করেছিলেন মাথাপিছু কুড়ি টাকা দিয়ে। সেই সব পশুর অর্ধেক তিনি জার্মানিতে আন্তর্জাতিক পশুবণিক জামরাচের কাছে পাঠিয়ে দেন। কলকাতায় নিয়ে আসেন কয়েকটি বাঘ, চিতা, ভল্লুক, লেপার্ড, বনবিড়াল, গণ্ডার এবং জিরাফ। বিক্রির আগে এই সব পশু ব্লিথ সাহেব রেখেছিলেন বউবাজারের কাছে টেরিটিবাজারে। সেখানে দর্শকপিছু এক টাকার বিনিময়ে সেই জন্তু প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছিলেন। লখনউর যোদ্ধা বাঘদের দেখতে রীতিমতো ভীড় জমে যেত এবং ক্লিথের বেশ ভাল আয় হত। অবশেষে তিনি একদিন একটি বাঘ জাহাজে করে লণ্ডনে পাঠালেন। সেই বাঘের দাম উঠল ১৪০ পাউণ্ড। মজার কথা, বাকি পশুগুলি তিনি বিক্রি করলেন ওয়াজিদ আলি শাহকে। ব্লিথ রাজার কাছ থেকে যে বাঘ মাথাপিছু কুড়ি টাকায় কিনেছিলেন তা তিনি রাজাকে আবার বেচলেন মাথাপিছু ১০০ পাউণ্ডে। তখন টাকা আর পাউন্ডের মূল্য মোটামুটি একই ছিল।

ডারউইন ব্লিথের কাছে রাজার চিড়িয়াখানা বিষয়ে নিয়মিত খোঁজখবর নিতেন। ডারউইন শুনে অবাক হয়েছিলেন যে রাজার নিযুক্ত প্রশিক্ষকরা গাড়ি টানার জন্য জিরাফকে তালিম দিচ্ছেন। ব্লিথের অন্যান্য খদ্দেররা ছিলেন চোরাবাগানের রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক, বর্ধমানের মহারাজা মহতাব চাঁদ ও মুর্শিদাবাদের নবাব ফেরাদুন জাহ। তবে ওয়াজিদ আলির আজাদ মঞ্জিলের চিড়িয়াখানার পাশে এই সব রাজা-নবাবদের পশুশালা ম্লান। লেডি

ডাফরিন একদিন গেলেন মেটিয়াবুরজের চিড়িয়াখানায়। বিচিত্র সব পাখি দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। লামা, বিষধর সাপ দেখে চমকে উঠলেন। রাজার চিড়িয়াখানার খবর শুনে খুব ক্রুদ্ধ হলেন প্রিন্স অব ওয়েলস। তিনি হুকুম দিলেন অবিলম্বে কলকাতায় সরকারি চিড়িয়াখানা তৈরি করা হোক। সি টি বাকল্যান্ডকে সেই দায়িত্ব দেওয়া হল। ইতিমধ্যে রাজা অকাল বার্ধক্যে পৌঁছে গিয়েছেন। বোচা ছাড়া এক পা চলাফেরা করতে পারেন না। আলিপুরে যে চিড়িয়খানা তৈরি হতে চলেছে তার প্রথম অধ্যক্ষের দায়িত্বে রামব্রহ্ম সান্যালের নাম ভাবা হয়েছে। তিনি আবার রাজার খুব গুণগ্রাহী। তিনি একদিন রাজার কাছে গিয়ে বললেন, মেটিয়াবুরজের চিড়িয়াখানা দেখবেন। রাজা অতিথিবৎসল মানুষ। তিনি সান্যাল মশাইকে একা ছাড়লেন না। বোচায় চড়িয়ে রাজাকে আটজন বেহারা নিয়ে গেল, পাশে হেঁটে হেঁটে গেলেন রামব্রহ্ম সান্যাল।

ওয়াজিদ আলি শাহ-র চিড়িয়াখানায় ছিল পঁচিশ হাজার পায়রা। হরেক কিসিমের—শিরাজি, গুলি, পেশওয়ারি, গুলবে, লক্কা, নোটন, চুয়া, চন্দন, ইয়াহু, গিরিবাজ, ফ্যানটেল ও আরও নানা জাতের। দুর্লভ সবুজ পরিন্দাও ছিল। রেশমি ডানাওয়ালা এক জোড়া পায়রা রাজা কিনেছিলেন চব্বিশ হাজার টাকায় আর একজোড়া শুভ্র কবুতর নিয়েছিলেন এগারো হাজার টাকায়। এই-সব অমূল্য পায়রাদের দেখভাল করার ছিল শতাধিক রক্ষী। দারোগা গুলাম আব্বাস ছিলেন নামী পায়রা বিশেষজ্ঞ।

রাজা পায়রাদের লড়াই আর হাওয়াবাজি দেখতে ভালবাসতেন। দারোগা পতাকা দেখালে পায়রারা উড়তে উড়তে এসে তার কাছে এসে বসত।

ওয়াজিদ আলি কলকাতায় বটের বাজি চালু করলেন। এই খেলা শুরু হয়েছিল পঞ্জাবে, পরে বাজিকরদের হাত ধরে আসে অবধে। এই বাজি সমৃদ্ধি লাভ করেছিল লখনউয়। মেটিয়াবুরজে কোয়েলের লড়াই বা বটের বাজি সাধারণত গৃহের অভ্যন্তরে হত। অনেক সময় হল ঘরে গালিচা পেতেও এই ক্রীড়া হত। লোকজন বাজি ধরত। রাজা ওয়াজিদ আলি ছোট পাখির খেলা ভালবাসতেন। এই সব পাখির চঞ্চু ছুরি দিয়ে ধারালো করা হত। পাখিদের সুসজ্জিত বাঁশের খাঁচায় আনা হত। এই খাঁচা ছিল গজদন্তখচিত। বট বা মুনিয়াদের অদ্ভূত সব নাম ছিল। কেউ রুস্তম, কেউ বা সোহরাব, কারোর নাম শাম, আবার কেউ হানিফা। দক্ষ বাজিকরদের লখনউ থেকে মেটিয়াবুরজে আনা হয়েছিল। তাঁরা রাজার আশ্রয়ে থাকতেন। এঁদের একজন হলেন দারোগা গুলাম আব্বাস ছোটে খান, অন্য জন গুলাম মুহাম্মদ খান খলিসপুরি। সমস্ত রকমের পাখি এই চিড়িয়াখানায় ছিল যাদের দিয়ে খেলা করানো যায়। পাখিদের তালিকা দেখলে ভিরমি খেতে হয়। তিতির, লাবওয়া, গুলডুম, মুনিয়া, লাল, পায়রা ছিল প্রধান। মোরগ লড়াইও মেটিয়াবুরজে জনপ্রিয় হল। রাজার শ্বশুর আলি নকি খানের বাড়িতে মোরগ লড়াইয়ের জমাটি আসর হত। বহু ইংরেজ কর্তা সেই আসরে উপস্থিত থাকতেন। আলি নকি থাকতেন তহনিয়ৎ মঞ্জিলে।

পশুদের লড়াই লখনউতে খুব জনপ্রিয় ছিল। সেই বাজি মেটিয়াবুরজেও চালু হল অচিরে। রাজা নাসিরুদ্দিন হায়দারের সময় পশুদের লড়াই তুঙ্গে ওঠে। রাজা ওয়াজিদ আলি অবশ্য পশুদের লড়াই একদম পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন, বড় হিংস্র এই নিরীহ প্রাণীদের জঙ্গ। খেলার নামে রক্তপাত তিনি ভালবাসতেন না। পাখিদের লড়াই বাদ দিলে রাম ছাগলের যুদ্ধ

তিনি মাঝেমধ্যে দেখতেন। যোদ্ধা রামছাগলদের বিশেষ ধরণের খাবার খাইয়ে বড় করা হত।

উপস্থিত দর্শকরা নির্দিষ্ট ছাগলের উপর বাজি ধরত। রাজার এক ওয়াজির মুনশি-উল-সুলতান এই রকম প্রচুর রাম ছাগলের মালিক ছিলেন। তিনি অনেকগুলো ছাগল কিনে কশাইদের পয়সা দিয়ে সেগুলো প্রতিপালন করতে দিয়েছিলেন।

ওয়াজিদ আলি শাহ-র চিড়িয়াখানা আজাদ মঞ্জিল ও মুরাসসা মঞ্জিলে আছে আটশো কর্মচারী। তিন শো লোক শুধু পায়রার দেখভাল করে। আর তিন শো কর্মচারী দেখাশোনা করে মাছের। চল্লিশ জন লোক সাপদের রক্ষণাবেক্ষন করে। এই সব কর্মচারীরা মাইনে পান মাসে ছয় থেকে দশ টাকা। উঁচু পদের কর্মচারীরা ত্রিশ থেকে চল্লিশ টাকা। চিড়িয়াখানার পশুপাখির জন্য খাবারে খরচ হয় মাসে পনেরো হাজার টাকা। মুনিস-উদ-দৌলাহ ও রাইহান-উদ-দৌলা চিড়িয়াখানার প্রধান দায়িত্বে আছেন। এই পশুশালায় আছে হাজার হাজার রকমের জন্তু। বাঘ সিংহ তো আছেই। আছে বাঁদর, হাতি, শিম্পাঞ্জি ইত্যাদি পশুও। আফ্রিকা থেকে আনানো হয়েছে এক জোড়া বিরাটাকার ও অদ্ভূত দর্শন জিরাফ। বাগদাদ থেকে এসেছে জোড়া কুঁজওয়ালা একটি উট, যা কলকাতার মানুষ কোনও দিন দেখেনি। সে উটের দেখভাল করেন নীলমোহন গাঙ্গুলি। সিংহ, বাঘ, চিতা, নেকড়ে, ভল্লুক, গুলবাগ, হায়েনা, বনবিড়াল রাখা বিভিন্ন খাঁচায়। তিনি খাঁচাগুলোর সামনে গিয়ে মাঝেমধ্যে দাঁড়ান।

তার পর তাকান আকাশের দিকে। উড়ছে রঙবেরঙের ঘুড়ি। রাজা নিজে পতঙ্গবাজি খুব পছন্দ করেন। মেটিয়াবুরজের আকাশে সেই ঘুড়ির সঙ্গে আটকানো থাকত স্বর্ণ বা রৌপ্যমূদ্রা। যে ঘুড়িটি

জিতে নেবে এ হল তার ইনাম। ওয়াজিদ আলি শাহ নিজে ঘুড়ির নকশা করতেন। ঘুড়ির পেছনে ধনুকের মত দুটি কাঠি লাগানোর প্রবর্তন করেন রাজা। তার আগে কলকাতার কারিগররা একটি মাত্র কাঠিকে ধনুকের মতো ব্যবহার করতেন। লখনউ থেকে ঘুড়িবিশারদ ইলাহি বখশ বিলায়েত আলিকে আনানো হয়েছিল। কলকাতার বাঙালি বাবুরা খুব তাড়াতাড়ি রাজার ঘুড়ি ওড়ানোকে নিজেদের সংস্কৃতির মধ্যে ঢুকিয়ে নিলেন। তাঁরা কিন্তু ঘুড়ির সঙ্গে স্বর্ণ বা রৌপ্যমূদ্রা আটকে দিতেন না, পরিবর্তে কাগজের টাকা ঘুড়ির সঙ্গে সেলাই করে দিতেন। মেটিয়াবুরজে ঘুড়ি নিয়েও লোকে বাজি ধরতে শুরু করল।

বাজি, নেশা, চুরি আর মারামারির উপদ্রব দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে লাগল ছোটা লখনউয়। পাশাপাশি বাড়তে লাগল অপরিচ্ছন্নতা। শহরের পৌরসভা নর্দমা পরিষ্কারে অবহেলা করতে লাগল। বিশুদ্ধ পানীয় জলের যোগানও এই অঞ্চলে অপ্রতুল। রাতে রাস্তায় গ্যাসের আলো জ্বলে না, বাজারে পড়ে থাকে নোংরা আবর্জনা। রাজা এই সব দেখে প্রথমেই পিলখানা ও ঘোড়ার আস্তাবল পরিষ্কারের হুকুম দিলেন। কশাইখানা তুলে দিলেন মেটিয়াবুরজের ভিতর থেকে। এলাকার বাইরে চলে গেল কশাইরা। মাংস অবশ্য মেটিয়াবুরজের ভিতরেই বিক্রি হতে লাগল। যত্রতত্র বাসস্থান নির্মাণ করে যে সব বস্তি বানানো হয়েছিল, তাদের অন্য বাসের ব্যবস্থা করে দিয়ে রাজা রাস্তা চওড়া করার নির্দেশ দিলেন।

রাজার কর্মচারীরা পুলিশ ও পুরসভার কাজ করে যাচ্ছেন। কিন্তু ওয়াজিদ আলির লোকবল কম, অর্থের যোগানও পর্যাপ্ত নয়। লক্ষাধিক লোকের বাস এই মেটিয়াবুরজে, রাজা কীভাবে সামলাবেন এত কিছু!

এলাকার কিছু মানুষ এই অস্বাস্থ্যকর এলাকা থেকে চলে গেলেন।

আওয়াধের রাজা ওয়াজিদ আলির আইন হল সেই নিয়ম, যা বানিয়েছে খোদ ইংরেজরা। অথচ একটু পুরনো লোকেরা জানেন, মেটিয়াবুরজে এক সময় বড় লাটের বাড়ি ছিল। তিনি মেটিয়াবুরজে প্রথমে আলো লাগানোর ব্যবস্থা লাগলেন। আর এতেই অনেক উপদ্রব কমে গেল। এর পর ধীরে ধীরে শুরু হল আবর্জনা সরানোর কাজ।

১৮৭৯ সালে রাজার পশুশালা থেকে দুটি বাঘ খাঁচা ভেঙ্গে পালিয়ে গেল। সেই নিয়ে মহা শোরগোল পড়ে গেল। ১৮৮০ সালে নতুন বড় লাট হলেন লর্ড রিপন, তার আগে ছিলেন লর্ড মেয়ো, তিনি আন্দামানে খুন হন। ১৮৮৪, নতুন বড় লাট লর্ড ডাফরিন। রাজা তাঁর নানা অসুবিধার কথা জানিয়ে অভিযোগপত্র পাঠালেন বড় লাটকে। কিন্তু কোনও ফল হল না। ১৮৮৬ রাজার সম্পত্তির বন্টন নিয়ে আগাম আলোচনা শুরু হল। ১৮৮৭, ২৫ এপ্রিল রাজা অসুস্থ হলেন। ওই বছরের ১৫ সেপ্টেম্বর মেটিয়াবুরজে চললো লুটপাট। ২০ সেপ্টেম্বর রাতে রাজার মৃত্যু হয়, ২১ সেপ্টেম্বর হয় শেষকৃত্য।

রাজা রেখে গেলেন তাঁর লেখা ও সুর করা অজস্র গজল, প্রচুর নাটক, কবিতা, নিজের তৈরি করা পঞ্জিকা। আর রেখে গেলেন তাঁর গঙ্গা-যমুনা তেহজিব, অসাম্প্রদায়িকতার মূল মন্ত্র ও মাথা বিক্রি না করার আপোসহীনতা।

Helpline

1800 120 2130

Whatsapp Chatbot

8017444111

Visit Us at

http://www.wbmdfc.org/

WEST BENGAL MINORITIES' DEVELOPMENT AND FINANCE CORPORATION

(A Statutory Corporation of Govt. of West Bengal)

"AMBER" DD-27/E, Sector-I, Salt Lake City, Kolkata-700064